কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য
(২য় খণ্ড)

উস্তায ইবরাহীম হাসান

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য

(২য় খণ্ড)

উস্তায ইবরাহীম হাসান

আল ফিরদাউস

সূচিপত্র

১৩ .সবর ও শোকর ৫

১৪. সময়ের হিফাজত (হিফজুল আওকাত): ৭

১৫. জিহাদের তরে জান-মালের নিঃশর্ত কুরবানী - ৯

১৬. দ্বীনকে নিজের মতের উপর প্রাধান্য দেওয়া ১০

১৭. গায়রত ও ইস্তিগনা ১১

১৮. শুরা বা পরামর্শ-ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি ১২

১৯. পরনিন্দা ও গীবত থেকে জিহ্বাকে সুরক্ষা ১৩

২০. ফিতনার সময় হকের স্পষ্ট উচ্চারণ ১৫

২১. মৃত্যুচিন্তা ও আখেরাত-কেন্দ্রিক জীবন ১৬

২২. তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী ও নব্য জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে আপসহীন ১৭

২৩. ফাসলুল খিতাব ১৮

২৪. উম্মাহর দুঃখে ব্যথিত হৃদয় ১৯

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

أمَّا بعد؛

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। এবং অবশ্যই মুসমিল না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না"। (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

নব্যুয়তের নূর যখন আঁধারে নিমজ্জিত পৃথিবীকে প্রথম স্পর্শ করেছিল, তখন থেকেই শুরু হয়েছিল সত্য ও মিথ্যার এক অবিরাম সংঘাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র সাহচর্যে এমন এক সোনালি কাফেলা তৈরি করেছিলেন, যাঁরা কেবল ইলমের ধারক ছিলেন না, বরং ছিলেন হকের পাহাড়। সেই মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে যুগে যুগে 'উলামায়ে রব্বানী' বা হকপন্থী উলামায়ে কেরাম আবির্ভূত হয়েছেন—যাঁরা বাতিলের আস্ফালনের সামনে কখনো মাথানত করেননি, যাঁদের কলম ও জবান ক্ষমতার মোহে কখনো বিক্রি হয়নি।

"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য: ১ম পর্ব"-এ আমরা দেখেছিলাম হকের পথে চলা সেই কাফেলার মৌলিক ভিত্তিগুলো। তাঁদের অন্তরের ইখলাস ও আধ্যাত্মিক গভীরতা, আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত খাশইয়াত, ইলম ও আমলের সেই অভিন্ন ও দুর্লভ সমন্বয় আমাদের হৃদয়ে নতুন করে ঈমানি উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। আমরা আরও অনুধাবন করেছিলাম—কীভাবে তাঁরা আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে অবতীর্ণ হন, কীভাবে জালেম শাসকের বিলাসিতাকে তুচ্ছ করে জিহাদ ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ্-র কণ্টকাকীর্ণ পথ বেছে নেন এবং কীভাবে যুহদ, বিনয় ও মখলুকের

প্রতি মমতা দিয়ে তাঁরা মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নেন। সেই সাথে তাঁদের বাসিরাত বা দূরদর্শিতা এবং সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসরণ তাঁদের দিয়েছিল এক অনন্য উচ্চতা।

কিন্তু বর্তমানের এই ফিতনাসংকুল সময়ে, যখন বাতিলের রূপ বহুবিধ ও ছদ্মবেশী এবং হকের পথ অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ, তখন এই রাহবারদের চেনার মানদণ্ডগুলো আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হকপন্থী আলেম কেবল তিনি নন, যিনি নিছক কিতাবের পৃষ্ঠায় দক্ষ বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ তর্কে পারদর্শী; বরং তিনি—যাঁর চরিত্রে মিশে আছে নববী গায়রাত ও আপসহীন তেজ, যাঁর হৃদয়ে অহর্নিশ স্পন্দিত হয় বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর নাড়ির ব্যথা, এবং যাঁর বজ্রকণ্ঠ বাতিলের তখতে কাঁপন ধরানো এক অবিনাশী স্পর্ধা। প্রথম পর্বের সেই আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আজ দ্বিতীয় পর্বে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো উন্মোচন করব, যা একজন আলেমকে কেবল একজন পণ্ডিতের গণ্ডি থেকে বের করে ইসলামী ইতিহাসের মহান বীর এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সার্থক উত্তরসূরির মর্যাদায় আসীন করে।

চলুন, হকের সেই আলোকবর্তিকাগুলোর আরও কিছু অবিচ্ছেদ্য ও বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য আমরা হৃদয়াঙ্গম করি। আল্লাহ তায়ালা লেখক-পাঠক উভয়কেই ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত দান করুন, আমীন।

১৩ .সবর ও শোকর

হকের এই সুদীর্ঘ পথ কখনোই মসৃণ কোনো পুষ্পশয্যা ছিল না, বরং ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে এ পথ এক বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ অভিযাত্রা হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। যুগে যুগে যারা সত্যের এই মহান ঝাণ্ডা বয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁদের ললাটে কখনো জুটেছে শাসকগোষ্ঠীর রোষানল, কখনো কারাবরণের নিঃসঙ্গ প্রহর, আবার কখনো বা চরম অর্থাভাবের নিদারুণ কষাঘাত। তবে একজন প্রকৃত হকপন্থী রব্বানী আলেম বা দাঈর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি সংকটের এই উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কখনোই ধ্রুবতারা হারান না। তিনি বিচলিত হন না এই ভেবে যে, তাঁর রব কি তাঁকে ভুলে গেলেন? বরং তিনি অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিশ্বাস

করেন যে, এই নিবিড় মেঘমালার আড়ালেই লুকিয়ে আছে রবের পক্ষ থেকে আসা মহাপুরস্কারের সেই কঠিন পরীক্ষা, যা স্বর্ণকে পুড়িয়ে খাঁটি করে।

আবার যখন ঘোর অমানিশা কেটে দ্বীনের বিজয়ের রক্তিম সূর্য উদিত হয় কিংবা পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য তাঁর দুয়ারে এসে করাঘাত করে, তখন তিনি আত্মতুষ্টির কৃত্রিম অহংকারে মত্ত হন না। তিনি নিজেকে ধরাকে সরা জ্ঞান করার মতো ধৃষ্টতা দেখান না; বরং রবের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় তাঁর মস্তক আরও বেশি বিনত হয়। এই 'সবর' তথা ধৈর্য এবং 'শোকর' তথা কৃতজ্ঞতা—এই দুই ডানায় ভর করেই একজন মুমিন তাঁর আধ্যাত্মিক আরোহণের সোপানগুলো অতিক্রম করে পরম মাবুদের নৈকট্য লাভ করেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এই সবরকারীগণের উচ্চমর্যাদা ঘোষণা করে বলেন-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا

"আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ দেখাতো—যখন তারা ধৈর্য (সবর) ধারণ করেছিল।" (সূরা আস-সাজদাহ: ২৪)

এই পবিত্র কালাম আমাদের সামনে এ সত্যই উন্মোচিত করে যে, দ্বীনি নেতৃত্বের (ইমামত) সুউচ্চ শিখরে আরোহণের অনিবার্য ও অলঙ্ঘনীয় শর্ত হলো সবর বা ধৈর্য। প্রতিকূলতার তপ্ত মরুভূমিতে অবিচল থাকাই মূলত হকের পথে টিকে থাকার সঞ্জীবনী শক্তি যোগায়। রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের এই দ্বিমুখী ও বৈচিত্র্যময় গুণাবলিকে এক বিস্ময়কর মোহনায় মিলিয়ে দিয়ে বলেছেন:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ... إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের ব্যাপারটি বিস্ময়কর! তার প্রতিটি কাজই কল্যাণকর। যদি সে সুখ পায় তবে শোকর করে, যা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি কষ্টে পড়ে তবে সবর করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর।" (সহীহ মুসলিম: ২৯৯৯)

একটি প্রাজ্ঞ ও উন্নত জীবনদৃষ্টিতে সবর এবং শোকর কেবল দুটি আভিধানিক শব্দ নয়, বরং এটি ঈমানের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব। যখন বাতিলের পক্ষ থেকে নির্মম আঘাত আসে, তখন একজন খাঁটি ঈমানদার একে কোনো বিপর্যয় মনে না করে বরং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের এক দুর্লভ

সুযোগ হিসেবে আলিঙ্গন করেন। অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠের অসহনীয় নির্জনতা তখন তাঁর কাছে রবের সাথে নিভৃতে অনুরাগের এক আধ্যাত্মিক নিকেতন হয়ে ওঠে। দারিদ্র্যের কশাঘাত তাঁর কাছে হয়ে ওঠে নফসের লালসার শিকল ভেঙে দেওয়ার এক অব্যর্থ হাতিয়ার। ঠিক তেমনিভাবে, যখন পার্থিব সাফল্যের স্বর্ণশিখরে তিনি আসীন হন, তখন নিজেকে 'সবজান্তা' বা 'সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী' ভেবে তিনি সত্যভ্রষ্ট হন না। তিনি সর্বদা সজাগ থাকেন এই ভেবে যে, এই সমস্ত নেয়ামত কেবলই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এক পবিত্র আমানত। ফলে তাঁর প্রতিটি আচরণে দম্ভের পরিবর্তে প্রকাশ পায় বিনয়ের এক স্নিগ্ধ আভা। হকের এই কণ্টকাকীর্ণ পথে সবর হলো মুমিনের দুর্ভেদ্য বর্ম, আর শোকর হলো তাঁর গন্তব্যে পৌঁছানোর অবিনাশী চালিকাশক্তি। এই দুই গুণের অপূর্ব সমন্বয় যার চরিত্রে সার্থক হয়ে ওঠে, শয়তান তাকে তাঁর আদর্শিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। বিপদের ঝঞ্ঝাবাতে তিনি পাহাড়ের মতো অটল, আর সুখের প্রাচুর্যে তিনি ফলবতী বৃক্ষের মতো নুয়ে পড়া এক প্রশান্ত ও স্থিতধী পথিক।

১৪. সময়ের হিফাজত (হিফজুল আওকাত):

একজন হক্কানী-রব্বানী আলেমের জীবনদর্শন জাগতিক লাভ-ক্ষতির তুচ্ছ মাপে রচিত হয় না; বরং তাঁর কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মহান রবের পক্ষ থেকে গচ্ছিত এক অমূল্য মহিমান্বিত আমানত। তিনি হৃদয়ের গহীন থেকে অনুভব করেন যে, তাঁর আয়ুষ্কালের প্রতিটি পলক, প্রতিটি নিঃশ্বাস কেবল তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, বরং তা উম্মাহর প্রতি এক বিশাল দায়বদ্ধতা। তাই সময়ের অপচয় তাঁর কাছে কেবল আলস্য নয়, বরং এক প্রকার রুহানি দহন এবং খিয়ানততুল্য অপরাধ। মুখরোচক আড্ডা, অন্তঃসারশূন্য তর্ক কিংবা লক্ষ্যহীন কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয়ে তিনি এই আমানত নষ্ট হতে দেন না। বরং তিনি হায়াতের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে বরকতের মণি-মুক্তো কুড়িয়ে নিয়ে গড়ে তোলেন তাঁর ইলমি ও আমলি সাম্রাজ্য।

সময়ের এই অনন্য সংরক্ষণ বা 'হিফজুল আওকাত'-এর ক্ষেত্রে পূর্বসূরি সালাফদের জীবন ছিল বিস্ময়কর ও কিংবদন্তিতুল্য। ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ'র জীবনী পাঠ করলে আমরা এক চমৎকার সবক খুঁজে পাই। তৎকালীন যুগে লেখার জন্য কলম শার্প করার প্রয়োজন হতো; তিনি কলম কাটার সেই যৎসামান্য মুহূর্তটুকুতেও আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন, যাতে জীবনের একটি কণা সময়ও আল্লাহর স্মরণ বিহীন অতিবাহিত না হয়।

সময়ের প্রতি এই তীব্র মমত্ববোধ এবং রবের প্রতি এই গভীর ভালোবাসা একজন সাধারণ মানুষকে 'রব্বানী' আলেমের সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন করে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে সময়ের এই অপরিসীম মাহাত্ম্য বোঝাতে স্বয়ং সময়ের শপথ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঘোষণা করেন:

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।" (সূরা আসর: ১-২)

এই কুরআনিক সতর্কবাণী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত এক অনিবার্য ক্ষয়। মানুষ প্রতিনিয়ত এক লোকসান ও দেউলিয়া হওয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে। কেবল তারাই এই চিরস্থায়ী ক্ষতি থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে,

যারা ক্ষণস্থায়ী সময়ের বিনিময়ে ঈমান ও সালিহ আমলের শাশ্বত সওদা করতে সক্ষম হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে মানুষের চরম অবহেলা ও উদাসীনতার এক করুণ সত্য মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে; তা হলো সুস্থতা এবং অবসর সময়।" (সহীহ বুখারী: ৬৪১২)

একজন সচেতন মুমিন ও রব্বানী আলেমের জীবন গড়ে ওঠে এই হাদিসের প্রজ্ঞা থেকে। তিনি অসুস্থতার অন্ধকার আসার আগেই সুস্থতাকে এবং ব্যস্ততার প্রবল ঝঞ্ঝা আসার আগেই অবসরকে 'গনিমত' হিসেবে লুফে নেন। যাঁর অন্তরে কিয়ামতের কঠিন ময়দানে প্রতিটি সেকেন্ডের হিসাব দেওয়ার তীব্র ব্যাকুলতা কাজ করে, তাঁর শব্দকোষে 'অলসতা' কিংবা 'সময় কাটছে না'—এমন অর্থহীন বাক্যের কোনো ঠাঁই নেই। সময়ের এই সূক্ষ্ম সংরক্ষণ বা 'হিফজুল আওকাত' কেবল সময়ের শাসন নয়, বরং এটিই হলো ইহকাল ও পরকালের সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি।

১৫. জিহাদের তরে জান-মালের নিঃশর্ত কুরবানী -

হকপন্থী রব্বানী আলেমের জীবন কেবল তাত্ত্বিক পাঠদান কিংবা ফতোয়ার কিতাবে সীমাবদ্ধ কোনো যান্ত্রিক অস্তিত্ব নয়; বরং তাঁর সমগ্র সত্তা হলো খোদায়ী প্রেমে সিক্ত এক জীবন্ত কুরবানি। তিনি যখন হকের নিশান হাতে রাজপথে কিংবা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তাঁর জান ও মাল কে জান্নাতের বিনিময়ে আরশের অধিপতির কাছে চিরতরে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁর এই কুরবানী কেবল মিম্বরের বাগ্মিতা নয়, বরং বাতিলের তপ্ত বুলেটের সামনে বুক পেতে দেওয়ার এক অবিনাশী স্পর্ধা। তিনি জানেন, দ্বীনের বাগান যখন শুকিয়ে যায়, তখন তা কেবল বক্তৃতার বারিধারায় সজীব হয় না; বরং সেখানে নিজের কলিজার তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের এই মহিমান্বিত কেনাবেচা সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, অতঃপর তারা (শত্রুকে) মারে এবং (নিজেরাও) শহীদ হয়।" (সূরা আত-তাওবাহ: ১১১)

একজন প্রকৃত আলেমের কাছে দুনিয়ার কোনো রক্তচক্ষু কিংবা শাসকের কারাগার ভীতির উদ্রেক করে না; কারণ তাঁর হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রজ্জ্বলিত থাকে শাহাদাতের পরম আকাঙ্ক্ষা। তিনি উম্মাহকে হাতে-কলমে এই সবক দেন যে—যখন ইসলামের সুউচ্চ মিনার ধূলিসাৎ হতে চায়, যখন তাওহীদের পতাকা ভুলুণ্ঠিত হয়, তখন মাদরাসার নিরাপদ দেয়াল, পারিবারিক স্নিগ্ধতা আর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে হিজরত ও জিহাদের কণ্টকাকীর্ণ ময়দানই হয় তাঁর চিরচেনা ঠিকানা। তাঁর কাছে ইলমের পাঠশালা আর শাহাদাতের রণাঙ্গন ভিন্ন কোনো পথ নয়, বরং একই মঞ্জিলের দুটি অবিচ্ছেদ্য বাঁক।

তাঁর এই আপসহীন ত্যাগই ঘুমন্ত উম্মাহর ধমনীতে ঈমানি চেতনার বিদ্যুৎ সঞ্চার করে। তাঁকে দেখেই সাধারণ মুমিনরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সাহস খুঁজে পায় এবং বাতিলের তখতে কম্পন ধরিয়ে দেয়। তিনি এমন এক অপরাজেয় ইশক ও মহব্বতের প্রতীক, যাঁর

সামনে দুনিয়ার কোনো বস্তুবাদী পরাশক্তিই টিকে থাকতে পারে না। মূলত শাহাদাতের এই তামান্নাই একজন আলেমকে সাধারণ পণ্ডিতের স্তর থেকে উন্নীত করে নবিগণের যোগ্য উত্তরসূরির মর্যাদায় আসীন করে।

১৬. দ্বীনকে নিজের মতের উপর প্রাধান্য দেওয়া

হকপন্থী রব্বানী উলামায়ে কেরামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁরা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, আবেগ কিংবা নিজস্ব মতের চেয়ে মহান আল্লাহর বিধান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দেন। দ্বীনের কোনো বিষয়ের সাথে যখন তাঁদের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি বা মর্জির সংঘাত বাঁধে, তখন তাঁরা নিঃসঙ্কোচে নিজের মতকে বিসর্জন দিয়ে শরীয়তের ফয়সালাকে শিরোধার্য করে নেন। তাঁদের কাছে 'হক' বা সত্য হলো তা-ই, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত; যা তাঁদের মনঃপুত হলো কি হলো না—তা সেখানে গৌণ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা করলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সেই বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোনো সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার বা সুযোগ থাকে না।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৬)

একজন প্রকৃত আলেম কখনও দ্বীনকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করেন না। বরং তিনি নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে ওহীর অনুগামী করেন। অনেক সময় কোনো মাসআলা বা সামাজিক বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ঝোঁক একদিকে থাকতে পারে, কিন্তু দালিলিকভাবে যখন বিপরীত বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তখন তিনি জনসম্মুখে নিজের পূর্বের ভুল স্বীকার করতে এবং সত্যকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। এটিই হলো তাঁর ইখলাস বা নিষ্ঠার পরিচয়। কারণ তাঁর লক্ষ্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ নিজের রাজনৈতিক দর্শন, সাংগঠনিক স্বার্থ কিংবা সামাজিক ঐতিহ্যের খাতিরে দ্বীনের বিধানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হকপন্থী

উলামাগণ এই স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, দ্বীন কোনো আপসের বস্তু নয়। তাঁরা শিখিয়ে দেন যে, বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে দ্বীন মাপা যাবে না; বরং দ্বীন দিয়েই বুদ্ধির সংশোধন করতে হবে।

এই গুণটিই একজন আলেমকে সাধারণ পণ্ডিত থেকে আলাদা করে দেয়। তাঁর এই নিঃশর্ত আনুগত্য দেখে সাধারণ মানুষও শিখতে পারে যে, ইসলামের মূল সৌন্দর্য হলো 'তাসলিম' বা আত্মসমর্পণ। যখন একজন আলেম নিজের খেয়াল-খুশির ঊর্ধ্বে উঠে দ্বীনকে স্থান দেন, তখনই তাঁর দাওয়াতে বরকত আসে এবং উম্মাহর মধ্যে একনিষ্ঠতার চর্চা শুরু হয়।

১৭. গায়রত ও ইস্তিগনা

একজন হক্কানি-রব্বানী আলেমের অনন্য ভূষণ হলো তাঁর গায়রত এবং মানুষের সম্পদের প্রতি চরম অমুখাপেক্ষিতা বা 'ইস্তিগনা'। তিনি তাঁর অর্জিত ইলমকে কখনো উদরপূর্তির মাধ্যম বা বৈষয়িক লাভের হাতিয়ার বানান না। তাঁর ললাট কেবল মহান রবের সিজদাতেই অবনত হয়; কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে কিংবা ধনকুবেরদের করুণা লাভের আশায় তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন না। এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই তাকে বাতিলের সামনে দাঁড়িয়ে আপসহীনভাবে সত্য উচ্চারণের সাহস জোগায়। তিনি ধ্রুব সত্যের মতো বিশ্বাস করেন—বিলাসবহুল পরাধীনতার চেয়ে অভাবী আত্মমর্যাদা হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ ও সম্মানের।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুমিনদের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

"অজ্ঞ লোকেরা তাদের আত্মমর্যাদাবোধের (অযাচিত সওয়াল না করার) কারণে তাদেরকে ধনী মনে করে।" (সূরা আল-বাকারা: ২৭৩)

একজন প্রকৃত আলেমের শান এমনই যে, তাঁর অভাব থাকলেও তিনি তা প্রকাশ করে বেড়ান না। ফলে বাইরের লোক তাঁর গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব দেখে তাঁকে সম্পদশালী মনে করে। তিনি মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে আল্লাহর কাছে হাত তোলাকেই নিজের আভিজাত্য মনে করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহিমান্বিত হাদিসটিই একজন আলেমের জীবনদর্শন হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ

"দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের হাতে যা আছে (সম্পদ) তার প্রতি বিমুখ হও, তবে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১০২)

রব্বানী আলেমগণ জানেন যে, মানুষের কাছে হাত পাতলে সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এবং দাওয়াতের প্রভাব নষ্ট হয়। যখন কোনো আলেম মানুষের সম্পদের মোহ ত্যাগ করেন, তখনই তিনি জনগণের প্রকৃত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন। তাঁর কথা তখন মানুষের হৃদয়ে তীরের মতো বিঁধে, কারণ তাঁর পেছনে কোনো পার্থিব স্বার্থ থাকে না। এই 'ইস্তিগনা' বা অমুখাপেক্ষিতার গুণই একজন আলেমকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন এবং হকের পথে পাহাড়সম অটল করে তোলে।

১৮. শুরা বা পরামর্শ-ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি

একজন রব্বানী আলেম কখনো একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা পোষণ করেন না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, মানুষ হিসেবে তিনি কখনোই 'ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে' নন। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংকট কিংবা জটিল দ্বীনি বিষয়ে তিনি উম্মাহর অন্যান্য বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলেমদের সাথে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করতে পছন্দ করেন। একাকী সিদ্ধান্ত নেওয়ার মোহ বা অহংকার তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আভিজাত্যকে কলঙ্কিত করে না; বরং তিনি পরামর্শের মাঝেই মহান রবের পক্ষ থেকে বরকত ও সঠিক পথের দিশা খুঁজে পান।

পরামর্শ বা 'শুরা' কেবল একটি সাংগঠনিক পদ্ধতি নয়, বরং এটি একটি খোদায়ী নির্দেশ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—যাঁর কাছে ওহী আসত— নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের (সাহাবীদের) সাথে পরামর্শ করুন।”

(সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি পরামর্শের মুখাপেক্ষী হন, তবে একজন সাধারণ আলেমের জন্য তা আরও বেশি জরুরি। পরামর্শের মাধ্যমে মানুষের মেধার সমন্বয় ঘটে এবং ব্যক্তিগত খামখেয়ালি বা ভুল সিদ্ধান্তের আশঙ্কা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সফল মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা আশ-শূরা নামক একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন। সেখানে তিনি মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“এবং তাদের (মুমিনদের) কাজগুলো পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।”

(সূরা আশ-শূরা: ৩৮)

হকপন্থী আলেমের অন্যতম বড় পরিচয় হলো তিনি অন্য আলেমদের মতামতের কদর করেন। তিনি জানেন যে, একাধিক হৃদয়ের ঐকমত্যে আল্লাহর সাহায্য ত্বরান্বিত হয়। পরামর্শের এই সংস্কৃতি আলেমদের মাঝে ঐক্য সুদৃঢ় করে এবং উম্মাহর সামনে একটি ইনসাফপূর্ণ ও শক্তিশালী কর্মপদ্ধতি উপস্থাপন করে। যে সিদ্ধান্তে পরামর্শ থাকে, সেখানে ব্যর্থতা আসলেও আফসোস থাকে না; কারণ তা ছিল সম্মিলিত প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। একজন রব্বানী আলেম এই 'শুরা' বা পরামর্শের মাধ্যমেই দ্বীনের আমানত রক্ষা করেন।

১৯. পরনিন্দা ও গীবত থেকে জিহ্বাকে সুরক্ষা

একজন রব্বানী আলেমের জিহ্বা হলো জিকির ও হিকমতের আধার। তিনি অন্যের সম্মানহানি করার মতো নিচু মানসিকতা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করেন। তাঁর প্রতিটি কথা মাপা এবং গভীর অর্থবহ। হকপন্থী আলেম যখন কোনো ব্যক্তি বা মতবাদের সমালোচনা করেন, তা ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা হিংসার বশবর্তী হয়ে নয়—বরং কেবল দ্বীনের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং উম্মাহকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচানোর তাগিদে। তিনি জানেন, জিহ্বার একটি অসতর্ক

স্ফুলিঙ্গ গোটা সমাজের ঐক্যকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে। তাই তিনি সর্বদা গীবত ও নামীমাহ (চোগলখুরি) নামক আত্মিক ব্যাধি থেকে নিজের রসনাকে পবিত্র রাখেন।

পরনিন্দা বা গীবতকে ইসলামে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

"তোমরা একে অপরের গীবত (পরনিন্দা) করো না।" (সূরা আল-হুজুরাত: ১২)

একজন আলেম এই আয়াতের মর্মার্থ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের গিবত করা মানে নিজের নেক আমলগুলোকে অন্যের আমলনামায় বিলিয়ে দেওয়া। তাই তিনি অন্যকে নিয়ে চর্চা করার চেয়ে নিজের ত্রুটি সংশোধনেই অধিক ব্যস্ত থাকেন।

ঈমানের পূর্ণতা ও জিহ্বার সংযমের মাঝে যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়। তিনি ইরশাদ করেছেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" (সহীহ বুখারী: ৬০১৮)

এই হাদিসটি একজন আলেমের জীবনের মূলনীতি। তিনি হয় ইলম ও কল্যাণের কথা বলেন, নতুবা নীরবতার মাঝে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। তাঁর নীরবতাও একটি শিক্ষা, আর তাঁর বক্তব্যও একটি হেদায়াত। তিনি মানুষের দোষ গোপন রাখেন যাতে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর দোষ গোপন রাখেন। জিহ্বার এই পবিত্রতাই একজন আলেমকে উম্মাহর কাছে নির্ভরযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর উপস্থিতিতে মানুষ নিরাপদ বোধ করে এবং তাঁর মজলিস হয় গীবতহীন এক জান্নাতি পরিবেশ!

২০. ফিতনার সময় হকের স্পষ্ট উচ্চারণ

যখন সমাজে বিভ্রান্তি, সংশয় ও ফিতনার কালো মেঘ ঘনীভূত হয়, তখন সুবিধাবাদী বা দরবারী আলেমরা জাগতিক স্বার্থে নীরবতা পালন করেন কিংবা হকের সাথে বাতিলের আপস ঘটান। কিন্তু একজন হকপন্থী রব্বানী আলেম সেই সংকটকালেও হকের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখেন। তিনি জনমতের তোয়াক্কা করেন না, স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন না; বরং কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলে বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করেন। তাঁর আপসহীন অবস্থান উম্মাহর জন্য অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে বাতিঘরের মতো কাজ করে, যা মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সত্য গোপনকারী বা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকারীদের সতর্ক করে ইরশাদ করেন:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা সত্যকে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে সত্য গোপন করো না।" (সূরা আল-বাকারা: ৪২)

একজন প্রকৃত আলেম জানেন যে, সত্য প্রকাশ করা তাঁর ওপর অর্পিত আল্লাহর এক পবিত্র আমানত। ফিতনার সময় মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন রব্বানী আলেমরাই দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে স্থিতি দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনাগত সময়ের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছিলেন:

سَتَكُونُ فِتَنٌ... فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ

"অচিরেই অনেক ফিতনা আসবে... (সে সময় আলেমদের দায়িত্ব হবে মানুষকে হকের আশ্রয় দেওয়া)।" (সহীহ বুখারী: ৭০৮১ হাদিসের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী)

ফিতনার এই কঠিন পরীক্ষায় আলেমগণ হলেন উম্মাহর ঢাল। তাঁরা রাজভয় বা লোকভয় উপেক্ষা করে বাতিলের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে সত্য ঘোষণা করেন, যাতে সরলমনা মুসলিমরা বিভ্রান্তির চোরাবালিতে হারিয়ে না যায়।

২১. মৃত্যুচিন্তা ও আখেরাত-কেন্দ্রিক জীবন

হকপন্থী আলেমের প্রতিটি স্পন্দন, প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি পদক্ষেপের নেপথ্যে থাকে পরকালের জবাবদিহিতার ভয়। তিনি এই নশ্বর পৃথিবীর চাকচিক্য বা সাময়িক খ্যাতির পেছনে মোহগ্রস্ত হয়ে ছুটেন না। তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা আবর্তিত হয় কবরের প্রথম রাত এবং কিয়ামতের সেই ভয়াবহ হিসাবকে কেন্দ্র করে। তাঁর বয়ান কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং তাতে আখেরাতের এক গভীর প্রভাব ফুটে ওঠে—যা পাষাণ হৃদয়েও কম্পন সৃষ্টি করে। তিনি জানেন যে, আজ যা অর্জন করছেন তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হবে পরপারে।

পার্থিব জীবনের অসারতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“আর পার্থিব জীবন কেবল ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।”

(সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

এই ধ্রুব সত্যটি একজন রব্বানী আলেমের মজ্জাগত। তিনি মৃত্যুকে কেবল জীবনের সমাপ্তি নয়, বরং মহান রবের সাথে সাক্ষাতের প্রবেশদ্বার মনে করেন। তাই তিনি সর্বদা নিজেকে এবং উম্মাহকে প্রস্তুত রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা স্মরণে রাখার তাকিদ দিয়ে বলেছেন:

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

“তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয় অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।”

(সুনানে তিরমিজি: ২৩০৭)

মৃত্যুচিন্তা একজন আলেমকে দুনিয়াদারির লোভ থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের খেদমত করার হিম্মত দান করে। তাঁর অন্তরে সর্বদা এই চেতনা জাগ্রত থাকে যে, পার্থিব সম্পদ ও পদমর্যাদা সবই ক্ষণস্থায়ী, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিই অবিনশ্বর।

২২. তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী ও নব্য জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে আপসহীন

একজন রব্বানী আলেমের দাওয়াতের মূল ভিত্তি এবং তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম মিশন হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—অর্থাৎ বিশুদ্ধ তাওহীদ। তিনি উম্মাহর ঈমানি আকিদাকে মাজারপূজা, পীরপূজা কিংবা ব্যক্তিপূজার মতো শিরক থেকে যেমন রক্ষা করেন, তেমনি আধুনিক যুগের চটকদার কুফরি মতবাদ ও 'ইজম'গুলোর পঙ্কিলতা থেকেও সুরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করেন। তাঁর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে এক আল্লাহর নিরঙ্কুশ গোলামিতে ফিরিয়ে আনা।

তিনি উম্মাহকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, শিরক কেবল মূর্তিপূজায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর আইনকে উপেক্ষা করে মানুষের তৈরি গণতন্ত্র (Democracy), ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) এবং ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ (Nationalism)-এর ইবাদত করাও নব্য জাহিলিয়াতের অংশ। তিনি ঘোষণা করেন যে, আইনদাতা ও বিধানদাতা হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নেওয়াই তাওহীদের অবিচ্ছেদ্য দাবি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিরকের ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয়ই শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম।" (সূরা লোকমান: ১৩)

হকপন্থী আলেম জানেন যে, আকিদাহ কলুষিত হলে এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের (হাকিমিয়্যাহ) সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করলে কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিরকের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে সেজদাহগাহ বানিয়ে নিয়েছে।" (সহীহ বুখারী: ৪৩৫)

একজন রব্বানী আলেম কেবল কবরের শিরক নিয়ে সরব নন, বরং তিনি প্রাসাদের শিরক ও মতাদর্শিক শিরকের বিরুদ্ধেও সমভাবে সোচ্চার। তিনি সমাজ থেকে কুসংস্কার ও বিদআতের শিকড় উপড়ে ফেলার পাশাপাশি পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত মানবরচিত মতবাদগুলোকে চূর্ণ করে ঈমানের পবিত্রতা রক্ষা করেন। তাঁর দাওয়াতের মূল সুর হলো—সাহায্যকারী, বিধানদাতা এবং ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। তাঁর এই বলিষ্ঠ অবস্থানের কারণেই উম্মাহ কিয়ামতের দিন এক আল্লাহর সামনে নিষ্কলুষ ঈমান নিয়ে দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারে।

২৩. ফাসলুল খিতাব

হকপন্থী রব্বানী আলেম 'ফাসলুল খিতাব' বা চূড়ান্ত মীমাংসাকারী প্রজ্ঞার অধিকারী, যিনি ধোঁয়াশাপূর্ণ মুহূর্তে সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর তুলে দেন। যখন সমাজে নানা ভ্রান্ত মতবাদ ও ছদ্মবেশী ফেতনার কালো মেঘ জমে, যখন সুবিধাবাদী আলিমরা শাসক বা পরিস্থিতির ভয়ে সত্যকে পাশ কাটিয়ে কৌশলের আশ্রয় নেয়, তখন তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সেই শাশ্বত তলোয়ার হাতে ময়দানে নামেন। তাঁর প্রতিটি শব্দ তখন সত্যের কষ্টিপাথর হয়ে দাঁড়ায়; যা মেকি চাকচিক্য ধুয়ে-মুছে আসলি হাকিকতকে উন্মোচিত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাতিলের মস্তক চূর্ণকারী হকের প্রকৃতি বর্ণনা করে বলেন:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

"বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়।" (সূরা আল-আম্বিয়া: ১৮)

এই পবিত্র বাণীর তেজের উত্তরাধিকারী হয়ে একজন হকপন্থী আলেম কখনোই কোনো মেকি বা কৃত্রিম ঐক্যের দোহাই দিয়ে সত্যের সাথে মিথ্যার কোনো প্রকার 'কো-এক্সিস্টেন্স' বা সহাবস্থান মেনে নেন না। তিনি জানেন, দুধের সাথে নাপাকি মেশালে তা আর দুধ থাকে না, বরং পুরোটা নাপাকিতেই পরিণত হয়। তাই তিনি আপসকামিতার পথ মাড়িয়ে 'লা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিল' (সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না)—এই আসমানী আদেশের জীবন্ত প্রতীকে পরিণত হন। তাঁর কণ্ঠস্বর যখন গর্জে ওঠে, তখন সন্দেহ ও দ্বিধার সমস্ত কুয়াশা নিমেষেই উবে যায় এবং হকের আলোকোজ্জ্বল মহাসড়ক উম্মাহর সামনে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এই অটল এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের হিম্মতই তাঁকে ইতিহাসের চরম সংকটে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ কাণ্ডারি হিসেবে অমর করে রাখে।

২৪. উম্মাহর দুঃখে ব্যথিত হৃদয়

একজন প্রকৃত রব্বানী আলেমের মানসপটে নিজস্ব ভূখণ্ড, ভাষা বা কৃষ্টির সংকীর্ণ গণ্ডি দৃশ্যমান থাকে না; বরং তাঁর হৃদয়ে স্পন্দিত হয় খিলাফাহর সেই বিশাল মানচিত্র, যেখানে কোনো কৃত্রিম কাঁটাতারের বিভেদ নেই। তাঁর চিন্তা ও মোনাজাতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মুসলিমের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা মিশে থাকে। পৃথিবীর দূরতম কোনো জনপদে যখন কোনো মুসলিম জালিমের শিকলে বন্দি হয়ে আর্তনাদ করে, কিংবা যখন কোনো মুসলিম বোনের ইজ্জতের উপর আঘাত আসে, তখন এই আলেম চুপ করে বসে থাকেন না। তাঁর এই তপ্ত দীর্ঘশ্বাস কেবল আবেগের বুদবুদ নয়, বরং তা উম্মাহর প্রতিটি ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া তাজা রক্তক্ষরণ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই অমর ঘোষণা তাঁর জীবনের মূল আইডিওলোজি-

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"মুমিনদের পারস্পরিক মহব্বত, দয়া ও সহমর্মিতার উদাহরণ একটি দেহের মতো; যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন পুরো দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।" (সহিহ মুসলিম: ২৫৮৬)

হকপন্থী আলেম এই হাদিসের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। তাঁর কাছে ফিলিস্তিন থেকে কাশ্মীর, আরাকান থেকে তুর্কিস্তান—সবই একই দেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি উম্মাহকে হাতে-কলমে এই সবক দেন যে, ঈমানি সম্পর্কই হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম জাতীয়তাবাদ। তিনি কেবল দোয়া বা চোখের পানিতেই দায়িত্ব শেষ করেন না, বরং তাঁর তেজস্বী লেখনী, উদাত্ত আহ্বান এবং সাংগঠনিক দূরদর্শিতা দিয়ে বিশ্বজুড়ে মজলুমের পক্ষে এক অপরাজেয় ঈমানি জনমত গড়ে তোলেন। তিনি উম্মাহর বিভক্তির দেয়ালে কুঠারাঘাত করে সবাইকে এক দেহ ও এক প্রাণে পরিণত করার নিরন্তর জিহাদে রত থাকেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক

অভিভাবকত্বের সুশীতল ছায়ায় উম্মাহর মাজলুমরা খুঁজে পায় এক চূড়ান্ত নির্ভরতা ও আশ্রয়ের ঠিকানা।

হকপন্থী উলামায়ে কেরাম হলেন ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় কাফেলা, যাঁরা পৃথিবীর ধূলিকণায় মিশে গেলেও তাঁদের আদর্শের সুবাস যুগ যুগ ধরে উম্মাহকে পথ দেখায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে শুরু করে বর্তমানের হকপন্থী উলামাগণ। তাঁদের কারণেই ইসলাম আজও তার মৌলিকরূপে টিকে আছে। মহান আল্লাহ আমাদের এই রব্বানী উলামাদের চেনার এবং তাঁদের ছায়াতলে থেকে দ্বীনের পথে অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।